দ্বিতীয় অধ্যায় । গাঁথা

ময়নামতী – গোপী চন্দ্রের গান ।

বাংলার নাথ সাহিত্যের মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ময়নামতী –গোপীচন্দ্রের গান । গ্রীয়ার্সন সাহেব ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গান 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। তিনি এই গান রংপুর জেলার গ্রাম থেকে এক নিরক্ষর গোপী গায়কের মুখে শুনে সংক্ষিপ্ত পাঠ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় এর একটি বিস্তারিত পাঠ সংগ্রহ করেন । বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "রংপুর জেলায় গোপী চন্দ্রের প্রাচীন গান কোনও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই । জোগী বা জুগী জাতীয় লোকমুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময় গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে ইহাদ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করে"। • • আলোচ্য ছড়াটি বাংলার লোক সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রচনা । বাংলায় ছড়ার আকারে গুম্ফিত কাহিনীর নিদর্শন খুবই কম মেলে। যে কয়েকটি মেলে, এই ছড়া তাদের মধ্যে অন্যতম এবং আয়তনের দিক দিয়ে সম্ভবতঃ তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ । এত দীর্ঘ ছড়া – আখ্যায়িকা যেকোন দেশেই বিরল ।এই দিক দিয়ে আলোচ্য ছড়ার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করার উপায় নেই ।" [১]

এই গোপীচন্দ্রের গানের আবিষ্কার ও প্রথম প্রকাশনার পরবর্তী কালে গ্রীয়ার্সন সাহেব এই গানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন পরবর্তী কালের গবেষকদের গবেষণার ফলে সে ধারণা দূরীভূত হয়েছে । এ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য । "গ্রীয়ার্সনের যুক্তির ত্রুটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট । ছড়াটির মধ্যে ইসমাইল পাত্রীর উল্লেখ নেই বলে তা যেমন ইসমাইল পাত্রীর আগে বলে প্রমাণিত হয়না, তেমনি তার উল্লেখ থাকলেও এটি তাঁর পরে রচিত বলে প্রমাণিত হত না, কারণ এই জাতীয় মৌখিক ছড়ায় পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশী । ছড়াটির প্রথম আবির্ভাব কাল যাই হোক না কেন, তাকে যে আকারে আমরা পাচ্ছি, তার মধ্যে আদিম-স্তরের ভাষা বা কাহিনী যে অবিকৃতভাবে মেলেনা, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এর ভাষা আদৌ প্রাচীন নয় ।" [২]

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনও এই গানের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে মত পোষণ করতেন পরবর্তীকালে তা পরিত্যক্ত হয়েছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' পাঁথাটিতে আমরা মোট পাঁচটি খণ্ড পাচ্ছি যেমন জন্ম খণ্ড, বুঝান খণ্ড, পণ্ডিত খণ্ড, মুণ্ডন খণ্ড ও সন্ন্যাস খণ্ড । এই পাঁচটি খণ্ডে গোপী চন্দ্রের মানিকচন্দ্র রাজার ঘরে জন্ম থেকে আরম্ভ করে সন্ন্যাসগ্রহণ ও নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রত্যাবর্তন, পুনর্মিলন ও রাজসুখে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে ।

এই পাঁথায় অনেক ধরণের পাঠ অনেক কবি ও সংগ্রাহকের লেখার মধ্যে দেখা যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভবানী দাস, দুর্লভ মল্লিক, সুকুর মাহমুদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ।

এবারে আমি গোপীচন্দ্রের গানের যে পুঁথিটি সংগ্রহ করেছি সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন । পুঁথির পাতায় পদরচয়িতার নাম পাওয়া যায় শ্রীমান ভুবন বৈরাগি । সাং জোড়েয়ার পার ইস্টেসি কোতোয়ালি মোতাবেক নিজ বেহার । কবির আবাসস্থল সম্পর্কে যা লেখা আছে তাতে স্পষ্টতই বোঝা যায় পুঁথি রচয়িতা বর্তমান কোচবিহার সহরের সংলগ্নপ্রায় উত্তরে অবস্থিত জোড়েয়ার পার নামক সাকিনের (গ্রামের) বাসিন্দা । পুঁথিটিতে মোট ২১টি পাতা পাওয়া যায় । বর্ণ বা লিপির মধ্যে বিশেষ প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়না তবে কালি ও কাগজের ব্যবহারদৃষ্টে মনে হয় পুঁথিটি আনুমানিক শতাধিক বৎসরের পুরাতন । এ সম্পর্কে আরও একটি যুক্তি দেখানো যায় পুঁথিতে কবি ঠিকানা দিয়েছেন কোচবিহার এর পরিবর্তে 'নিজ বেহার'। কোচবিহার রাজ্যের বর্তমান নামকরণ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে স্থির হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ন এর পূর্বে অবধি মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের (১৮৪৭–১৮৬৩) রাজত্বকালে কোচবিহার-এর নাম বেহার বা নিজ বেহার নামেই পরিচিত ছিল সেকারণে পুঁথির বয়স শতাধিক বৎসর পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক । কাহিনীগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যায় এই পুঁথির মধ্যে বিস্তারিতভাবে জন্ম খণ্ড, বুঝান খণ্ড, পণ্ডিত খণ্ড, মুণ্ডন খণ্ড প্রভৃতি নেই । এখানে প্রধানতঃ পালাটি আরম্ভ হয়েছে গোপীচন্দ্রের মা-এর উপদেশ বাক্যের মাধ্যমে —

"গুরু ভজ নাবিড় নিমাই এ অনাই চাওয়া ।
মইলে যেন সোনার দেহ না ফেলায় টানিয়া ॥
গুরু ছচা পিত্তে কাচা সর্বলোকে কয় ।
গুরু না ভজিলে দেহা অদপতি যায় ॥

ঐ মত অবাগনির পুত মা হইয়ে বুঝায় ॥
মায়ের মুখতে মোহারাজা এতেক শুনিল ।
রধুনার পদুনার তরে কথা বলিতে লাগিল ॥

রদুনা পদুনা তাকে সন্ন্যাস গমনের জন্য সর্ত বেঁধে দিল তার মাওমএনা যদি বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে তবেই তিনি সন্ন্যাসে যেতে পারবেন। পরবর্তীকালে নানা পরীক্ষায় 'মাও মএনা' উত্তীর্ণ হলেন এবং পুঁথিটি সমাপ্ত হয়েছে এইভাবে —

নারীকুলে অবাগনি বিফলে পরানু ।
একরাত্রি স্বামীর কোলে শুকে না বশিনু ॥
ধন দৌলত নাই গোলাত না ধরে এন্দুর ।
যে নারীর সামি নাই বা মোবায় খোন্দুর ॥
যখন কালে মোহারাজা রাণির মুখে এতেক শুনিল ।
রাণির সইকাতে কথা বলিবার লাগিল ॥
রদুনা খেতুক লইয়া ভোগু রাজা নবভাঙ্গার বোনে ।
মোর রাজার মেলানি হইল হারি পুরুর সঙ্গে ॥

'হারি পুরুর' সঙ্গে মেলানি অর্থাৎ সন্ন্যাসে যাত্রার উদ্যোগ নিয়ে পুঁথির অংশটি সমাপ্ত হয়েছে ।

পুঁথির ভাষার প্রকৃতি দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় পুঁথিটি কামরূপী উপভাষা অর্থাৎ রাজবংশী উপভাষায় রচিত । এবং এই ভাষা কোচবিহার জেলা ও তৎসংলগ্ন স্থানের ভাষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ।তবে বানান সম্পর্কে বাঁধাধরা কোন নিয়ম এতে মেনে চলা হয়নি যেমন 'গঙ্গা' বানান কোথাও লেখা হয়েছে 'গংগ' কোথাও 'গঙ্গে আবার কোথাও বা 'গঙ্গা' । (১–২ পৃষ্ঠা)

রদুনা ও পদুনার চরিত্র ও মানবিক গুণে অপূর্ব রসমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়, "বয়সে এরা নবীন, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এদের কিছুই নেই। রাজপুত্রকে ঘিরে যে মধুর এক জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার বাইরে যে এক নিষ্ঠুর জগৎ আছে, তা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল ।....শিশুসুলভ সরলতাই ছিল তাদের চারিত্রিক সৌন্দর্য।....নারী হৃদয়ের এই করুণ আর্ত কাহিনীকে

করুণ রসঘন করে তুলেছে।" ৩

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য —

"শুন শুন মোহারাজা শুন চিত দিয়া ।
আমাক দুই বৌ নিক নেও সংশিতা করিয়া ॥
সঙ্গে করিয়া নও প্রেশনাথ রাস্তায় চলিয়া জাব।
ভাই তার বৌ নিব মত শশুর বইয়া যাব ॥
তোমার মুখ শুকান দেখিয়া এ পান যোগাব।
রক্ষ হরিসের বেল চুরতি ভোজাইব ॥
শিতে দিব স্রিত শাচেরা পুয়ে শাকার বাও।
বরিস্রা কলিতে দিব চন্দ্রর বুখের নাও ।
দয়েয়া যদি থাকে মোহারজ ছারিয়া না যাও !"

পুঁথির মধ্যে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলার প্রচলিত বিভিন্ন পালাগানের মধ্যে ধুয়া হিসাবে যেসমস্ত পদ বর্তমান প্রচলিত আছে তা এই পুঁথির মধ্যেও দৃষ্ট হয় । যথা —

'যার গৃহে আছে স্বামি রান্ধে অন্ন খায় ।
জার গৃহে নাই স্বামি ভাবিতে জর্ম্ম যায় ॥
যার গৃহে আছে স্বামি পুনাবত্ত কলা ।
যার গৃহে নাই স্বামি তার ঘরে অন্দিহারা ॥
খোশত কৈতর নাই প্রেশনাথ কি করে তার খোপে ।
যে নারীর পুরুষ নাই কি করে তার রূপে ।

কিংবা রাজার কথায় —

দুখ শুক কপালের লেখা মুখু লেখা পায়
যা লেখিছে ইদিষ্টে খণ্ডন না যাবার নয় ॥

সিপাইদের বর্ণনায় হাস্যরসের যে অবতারনা করা হয়েছে তার মধ্যেও পুঁথি রচয়িতার বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে —

এক এক সিপাই সাজে নালকুর্তা গায় ।
হাঁটু পরি বন্দুক মারে দলান ফাটিয়া যায় ॥
তার পারে সাজে সিপাই বন্দুক লইয়া হাতে ।
হাটিতে না পারে সিপাই ছালা পেটের ভরে ॥
তার পারে সাজে সিপাই বন্দুক লইয়া হাতে ।
দুই কুরি চাউল লাগে একজন খাইতে ॥'

এই ভাবে দেখা যায় এই পুঁথিতে সমাজের আরও নানাধরণের ঘটনাবলীর কথা যা উত্তরবঙ্গের সমাজ-জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ ।

প্রমান পঞ্জী : দ্বিতীয় অধ্যায়

১,২। গোপীচন্দ্রের গান (ক. বি. প্রকাশিত) যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। ৩। সাহিত্য প্রকাশিকা। বাংলার নাথ সাহিত্য। ২৭ পৃঃ সম্পাদক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী